বাংলাদেশের বিজয়ের সেই দিনগুলি

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

৫১ বছর আগে গোটা বিশ্বে দিনের আলো ফোটার আগেই বাঙালিরা যেখানেই ছিলেন, টিভি বা রেডিও ঘুলে বসে পড়েছিলেন সুসংবাদটি শোনার জন্য। বেলা যত বাড়তে থাকে, বাঙালির মনে একটি প্রশ্ন কখন পৃথিবীর মানচিত্রে উঠে আসবে নতুন দেশটি, যার নাম হবে বাংলাদেশ। ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটেয় ৯৩ হাজার সেনা নিয়ে দূর্দান্ত প্রতাপ শালী ইয়াহিয়া-ভুট্টোর বাহিনী আত্মসমর্পন করল। তার ১৫/২০ মিনিট পরেই পৃথিবীর মানচিত্রে উঠে এল একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ। আমরা কলকাতায় বসে দেখেছি ৯ মাস ধরে দেশ স্বাধীন করার জন্য হাজার হাজার মুক্তিবাহিনী ভারতের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিএসএফ এর কাছে ট্রেনিং নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ৯ মাসের দীর্ঘ যুদ্ধ, ভারতের সংসদে বিরোধী দলের নেতারা একসুরে দাবি করতে থাকেন ওপার বাংলার বাঙালিদের বাঁচাতে হবে। তখনকার প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে প্রতিদিন বলতেন, আপনরা যে দাবি তুলছেন সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। সময়মতো সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমিও আপনাদের মতো চিন্তিত, উদ্বিগ্ন।

সেই ন-মাসের ঘটনার তো কোনও বিরাম নেই। ৭ মার্চের বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ কার্যত এটিই ছিল তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণা। সম্প্রতি তাঁর সুযোগ্য কন্যা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তিনি একটি বই লিখেছেন, বইটির নাম, “মুজিব বাংলার, বাংলা মুজিবের”। সেখানে তিনি লিখেছেন ‘ঐতিহাসিক ভাষণ যখন তিনি দেন, তখন তাঁর হাতে কোনও কাগজ ছিল না। ছিল না কোন নোট। চোখের চশমাটা খুলে টেবিলে রেখে তিনি ভাষণটা দিলেন ঠিক সে কথা যা তাঁর মনে এসেছিল। বাংলার মানুষের মনে প্রতিটি কথা গেঁথে গিয়েছিল। ‘স্বাধীনতা’ শব্দটা বুকে ধারণ করে তিনি যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা দেশের মুক্তিকামী মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বিজয় অর্জন করেছিল। শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হয়েছে। এ ভাষণের আবেদন আজো অটুট। পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষণ এতদিন ধরে আবেদন ধরে রাখতে পারেনি। এই ৫০ বছর ধরে এই ভাষণ কতবার এবং কত জায়গায় বাজানো হয়েছে! কত মানুষ শুনেছে, তা কি কখনও হিসাব করা গেছে? যায়নি। প্রতিবছর ৭-মার্চে ভাষণ বাজানো হচ্ছে ঢাকা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত, মানুষ এ ভাষণে প্রেরণা পায়। ১৯৭৫ সালের পর ২১ বছর সময় লেগেছে এ ভাষণ জনগণের সামনে সরকারিভাবে প্রচার করার জন্য। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আসার পর সরকারি গণমাধ্যমে এ ভাষণ প্রচার শুরু হয়। আজ এই ভাষণ ডকুমেন্টারি হেরিটেজ বা বিশ্ব প্রামান্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতিসংঘের ইউনেস্কো তার মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার-এ বঙ্গবন্ধুর ৭-ই মার্চের ভাষণ অর্ন্তভুক্ত করেছে।

‘দ্যা ওয়ার্ল্ডাস গ্রেটেস্ট স্পিচেস’ শীর্ষক রেফারেন্স বইয়ে এই ভাষণ স্থান পেয়েছে। লেখক ও ইতিহাসবিদ জ্যাকব এক এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস দ্য স্পিচেস দ্যাট ইনস্প্যায়ার্ড স্টোরি গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ। বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন ‘ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। সাত কোটি মানুষরে দাবায় রাখতে পারবা না।’ গেরিলা যুদ্ধের রনকৌশল ছিল এই ভাষণে । পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা প্রস্তুত রেখেছিল তাদের সমরাস্ত্র। শেখ মুজিব তাঁর ভাষণে কী বলেন, তা শুনেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ময়দানে। এয়ার এ্যাটাক করবে এবং গুলি করে সমবেত মানুষকে হত্যা করে তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু ৭ মার্চের ভাষণের রনকৌশলে বাঙালি জাতি আশ্বস্ত হয়ে সকল প্রস্তুতি নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গ্রাম বাংলায়। প্রস্তুতি নিয়েছিল যুদ্ধের। প্রতিটি ঘর পরিণত হয়েছিল একেকটি দুর্গে। প্রতিটি মানুষ হয়েছিল একেকজন যোদ্ধা। ওই ভাষণ ছিল সকলের প্রেরণার উৎস। আর সে কারণেই বাঙালি এত দ্রুত বিজয় অর্জন করতে পেরেছিল।

বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনামাফিক আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা কলকাতায় পৌঁছে যান। পৌঁছে যান ৬৯ সালে পূর্ববাংলার নির্বাচনে নির্বাচিত ৩০০জন জনপ্রতিনিধি এবং পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ববাংলার ১৬৯ জন প্রতিনিধি। তারা কলকাতায় একটি সিনেমা হলে সভা করে ৫ জন প্রতিনিধিকে বেছে নেন অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য। সেই কর্মসূচি অনুযায়ী এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর সরকার গঠিত হয়। সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন তাজউদ্দিন আহমেদ। ক্যাপ্টেন মনসুর আলি, আবু হেনা কামারুজ্জামান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পান। বিদেশ মন্ত্রক দায়িত্ব দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধুর খুনি খন্দকার মোস্তাককে। সকালে কলকাতা থেকে দেশি-বিদেশি ১৫০ জন সাংবাদিককে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বিএসএফ তাদের গাড়িতে করে নিয়ে গেলেও আমরা কনভয়ের মধ্যে নিজেদের গাড়িতে ছিলাম। ঘটনাটা খুব গোপন রাখা হয়েছিল। তারপর চলে যুদ্ধ যুদ্ধ প্রস্তুতি। কিন্তু পাকিস্তান বাঙালি হত্যায় এক মুহূর্তের জন্য থেমে

থাকেনি। অপরদিকে মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী, যৌথবাহিনী এবং বিএসএফ জওয়ানরা লড়াই চালাচ্ছিল। বাংলাদেশে ঢুকে দেখেছি মুক্তিবাহিনীরা পাকিস্তানের একের পর এক বাঙ্কার গুড়িয়ে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধি উত্তরবঙ্গে শরণার্থী ক্যাম্পে এসেছিলেন। সেখানে তিনি রাত কাটান শিলিগুড়ির কাছে সামরিক বাহিনীর ৩৩ ডিভিশনের সদর দপ্তরে। জওয়ানদরে উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে গিয়ে শ্রীমতি গান্ধী বলেছিলেন যুদ্ধ হবে। তোমরা কি যুদ্ধে জিততে পারবে? জওয়ানরা বন্দুক উচিয়ে বলেছিলেন, ''হামলোগ জিতেগা''। তারপর তিনি দিল্লি ফিরে গিয়ে ওয়াশিংটন চলে যান নিক্সনের কাছে। নিক্সনের কাছে তিনি হাতজোড় করে বলেছিলেন, আপনি পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করুন, যাতে বাঙালি হত্যা বন্ধ করে। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

পেন্টাগন থেকে পাকিস্তানকে যতরকম বাঙালি হত্যা করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৩ ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধি কলকাতা বিগ্রেড প্যারেড গ্রাইন্ডে বিশাল একটি জনসভা করছিলেন। সেদিনই খবর আসে পাকিস্তান দিল্লিসহ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, আগ্রায় বোমাবর্ষণ করেছে। মিটিং ছেড়ে আমরা আগাম রাজভবনে পৌঁছে গেলাম। গেটে দাঁড়িয়েছিলেন মূখ্যসচিব নির্মল সেনগুপ্ত। তিনি কতগুলো টেলেক্স বার্তা শ্রীমতি গান্ধির হাতে দিলেন। উনি বললেন, ''তুমি পড়ে যাও''। নির্মলবাবু পড়ে গেলেন পাকিস্তান কোথায় কোথায় বোমা মেরেছে। আমরাও দ্রুত তার পেছনে দমদম বিমানবন্দরে চলে গেলাম। বিমানের সিড়িতে পা দিতেই আমি প্রশ্ন করেছিলাম পাকিস্তান আক্রমণ করেছে। আপনি কিছু বলছেন না। উনি হাত জোর করে বললেন, আমাকে তিন ঘন্টা সময় দাও। আমি রেডিওতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেব। দিল্লিতে ফিরে গিয়ে তিনি ভাষণে বলেছিলেন, পাকিস্তান বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে।

ভারত তার সমুচিত জবাব দেবে। বাংলাদেশ হোগা, হোগা, হোগা। জয় হিন্দ্, জয় বাংলা বলে স্লোগান দিলেন। পাকিস্তান সেদিন রাতেই বনগা সীমান্ত দিয়ে ৬টি ট্যাঙ্ক পাঠিয়েছিল। ভারতীয় সামরিক গোয়েন্দাবাহিনী সেগুলিকে ঢুকতে দিয়েছিল। তারপর ভারতীয় ট্যাঙ্ক দিয়ে তাদের ঘিরে রাখে। পরে সেই ট্যাঙ্কগুলো গুড়িয়ে দেওয়া হয়। ৭ দিনের মাথায় পাকিস্তান বাহিনী চরম পদর্দুস্ত হয়ে পড়ে। ৯০ শতাংশ বাংলাদেশের এলাকা যৌথবাহিনীর সেনারা দখল করে নেয়।

১১ ডিসেম্বর তাজউদ্দিন সরকার যশোরে একটি জনসভা করে। সেই জনসভায় তাজউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন, ৭ দিনের মধ্যে ঢাকা দখল করে নেব। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। জয় আমাদের প্রায় হয়েই গিয়েছে। এদিকে আকাশবানী থেকে ভারতের সামরিকবাহিনীর প্রধান ঘনঘন হিন্দি, উর্দু, ইংবেজি ও বাংলার পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেন আপনারা কে কোথায় আছেন জানি। এখনই ভারতীয় সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করুন, নাহলে আপনারা আর পাকিস্তানে ফেরত যেতে পারবেন না।

৫১ বছর আগের ঘটনা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাজউদ্দিনের উদ্দেশ্য করে বলেন সচিবালয়ে গিয়ে দেখি (যার নাম আমরা মুজিবনগর করেছিলাম) যা যা করছে, কেউ কোথাও নেই। চলে গেলাম হিন্দুস্থান হোটেলে। যে ঘরে ডিপিধর থাকতেন, সেটির দরজা খোলা। ভিতরে পাঁচজন মন্ত্রী। মানেকেশ পূর্বাঞ্চলের প্রধান জয়দীপ সিং আরোরা, জেনারেল সওগত সিং, জেনারেল জেকব এবং জেনারেল ভোলা সরকার। তাদের সামনে ঢাকা শহরের একটি বড়ো মানচিত্র। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টসহ ছাউনিগুলো একদিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে, অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকদের বাসস্থান চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাজউদ্দিন বলছেন সামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করুন, সিভিলিয়ান এলাকায় বোমাবর্ষণ করেবন না। ভারতীয় সামরিক বাহিনী তাজউদ্দিনের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

১১ তারিখ সকালেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর কয়েকটি বিমান বাংলাদেশের ওপর চক্কর দিয়ে আসে। পাকিস্তানের হাতে তখন কোনও বিমান বা ট্যাঙ্ক ছিল না। ১২ ডিসেম্বর পোর্ট উইলিয়াম থেকে জেনারেল জেকব পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি হত্যার নায়ক জেনারেল নিয়াজিকে ফোন করে বলেন এখন তো আপনাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে একটু পরেই আমি ঢাকায় আসছি। নিয়াজি রাজি হলেন। জেনারেল জেকব, ভোলা সরকার, সওগত সিং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়াজির সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব দেন। জেকব তাকে বলেছিলেন, আপনি আপনার পরিবার এবং ৯৩ হাজার সেনাকে নিয়ে আত্মসমর্পন করুন। জেকব নিজেই আমাকে বলেছিলেন, কতবার আমরা আত্মসমর্পণের কথা বলছি ততবার নিয়াজি পাল্টা বলছিলেন, আত্মসমর্পণ নয়, যুদ্ধবিরতি। তাদের মধ্যে ৪০ মিনিট কথা হয়। জেকব বললেন, জেনালের আমরা ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের কোনও নিরাপত্তা আমরা দিতে পারবো না। নিয়াজি জেকবকে বললেন, আমাকে ১০ মিনিট সময় দিন। পাশের ঘরে গিয়ে তিনি ভুট্টোর সঙ্গে কথা বলেন। জেকবকে তিনি বলেন, তাহলে কখন সারেন্ডার হবে? উত্তরে তিনি বলেন, কলকাতা ফিরে গিয়ে জানাব। তাকে রাতে জানিয়ে দেওয়া হলো তিনদিন পর ১৬ ডিসেম্বর। সারেন্ডার অনুষ্ঠানে নিয়াজি তার ব্যাজগুলি খুলে টেবিলের ওপর রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীতে এই আনন্দ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় বাঙালিরা উল্লাসে মেতে ওঠে। নিয়াজিকে নিয়ে পোর্ট উইলিয়ামে চলে আসেন জেকব। তখন রাত ৮টা। আমি নিয়াজির সাক্ষাৎকার চাইলাম। জেকব ভেতরে গিয়ে নিয়াজিকে বোঝালো আমাকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে জেকব চেষ্টা করলেও নিয়াজি বলে দেন

তাঁর মাথা ধরেছে। কথা বলতে পারবেন না। পূর্ব বাংলা একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম নিল। পাকিস্তান ভেঙ্গে দুই টুকরো হলো।

কন্ট্রোল রুম থেকে ইন্দিরা গান্ধিকে ফোন করা হলো। আর ১৫/১৬ মিনিটের মধ্যে আমরা লাহোর দখল করতে পারি। আমাদের সেনারা যেখানে দাড়িয়ে আছে তারা নির্দেশ চায়। ওয়াররুমের সদস্যদের খবর দেওয়া হলো। শ্যামমোনকেশকেও তলব করা হলো। ইন্দিরা গান্ধি একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখনকার ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজজগজীবন উল্লসিত হয়ে বললেন বহিনজি আমি কালই লাহোর যাব। আপনি লাহোর দখল করার নির্দেশ দিন। ইন্দিরা সভার কাথা শুনে অর্থমন্ত্রীকে বললেন, ভারতীয় সেনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানেই থাক। আর এগোতে হবে না। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না। ইন্দিরা গান্ধি বললেন, ৬২ তে চিনের সঙ্গে যুদ্ধ, ৬৫ তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, আবার কালই চলে আসবে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা। আমাদের ভাণ্ডার শূণ্য শ্যামযেই কথায় সায় দিলেন। অন্যান্য মন্ত্রীরাও সায় দিলেন। আর কলকাতা শহরে দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় মিছিল। তারা স্লোগান দিচ্ছে, এশিয়ার মমিমূর্ত ইন্দিরা গান্ধি যুগ যুগ জিও। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই। আর এই যুদ্ধে (১৩ দিন) আজকের বাংলাদেশ আর্থিক দিক থেকে বলীয়ান হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মনে আছে, ঢাকার কন্টিনেন্টাল হোটেলের লবিতে মাইক হাতে লে: জেনারেল ভোলা সরকার সাংবাদিকদের বলছেন ঢাকার রায়ের বাজারে একটি পুকুরে কয়েকশ মৃতদেহ পড়ে আছে। তিনি আমাদের সেখানে নিয়ে গেলেন। এরা সকলেই ছিলেন বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, শিক্ষক। ১৩ থেকে ১৬ তারিখের মধ্যে পাক সেনারা তাদের গুলি করে মেরে সেখানে ফেলে দিয়েছিল। সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করতে ছেয়েছিল। সববিছুকে মিথ্যা প্রমাণীত করে শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মতোই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বপ্ন পূরণের নতুন দিগন্তে এখন বাংলাদেশ।

#

লেখক: মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননাপ্রাপ্ত ভারতীয় সাংবাদিক

১১.১২.২০২২ পিআইডি ফিচার